

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

খন্দক যুদ্ধ (غزوة الأحزاب) ৫ম হিজরীর শাওয়াল ও যুলক্বা‘দাহ (মার্চ ৬২৬ খৃ.)

‘খন্দক’ অর্থ পরিখা। এই যুদ্ধে মদীনার প্রবেশপথে দীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়েছিল বলে একে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। ‘আহযাব’ অর্থ দলসমূহ। মদীনা রাষ্ট্রকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য কুরায়েশদের মিত্র দলসমূহ এক হয়েছিল বিধায় একে ‘আহযাবের যুদ্ধ’ বলা হয়।

মদীনা থেকে বনু নাযীর ইহুদী গোত্রটিকে খায়বরে নির্বাসনের মাত্র ৭ মাসের মাথায় খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খন্দকের এই যুদ্ধ ছিল মদীনার উপরে পুরা হিজাবব্যাপী শত্রু দলগুলির এক সর্বব্যাপী হামলা। যা ছিল প্রায় মাসব্যাপী কষ্টকর অবরোধের এক দুঃসহ অভিজ্ঞতাপূর্ণ অভিযান। এই যুদ্ধে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১০,০০০। যা ছিল মদীনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মিলে মোট জনসংখ্যার চাইতে বেশী। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০০০। কিন্তু তারা যে অভিনব যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেন, তা পুরা আরব সম্প্রদায়ের নিকটে ছিল অজ্ঞাত। ফলে তারা হতাশাগ্রস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধের নেপথ্যচরী ছিল মদীনা থেকে বিতাড়িত বনু নাযীর ইহুদী গোত্রের নেতারা। মদীনার শনৈঃশনৈঃ উন্নতি দেখে হিংসায় জর্জরিত খায়বরে বিতাড়িত বনু নাযীরের ইহুদী নেতারা ২০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মক্কার কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ এবং নাজদের বেদুঈন গোত্র বনু গাত্তফান ও অন্যান্য বড় বড় গোত্রের কাছে প্রেরণ করে। তারা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলের সাধারণ শত্রু মুসলিম শক্তিকে নির্মূল করার জন্য প্ররোচিত করে। ফলে সমস্ত আরবে মদীনার বিরুদ্ধে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। অতঃপর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কেনানা ও তেহামা গোত্রের মিত্রবাহিনী মিলে ৪,০০০ এবং বনু সুলায়েম ও বনু গাত্তফানের বিভিন্ন গোত্রের ৬,০০০ মোট দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সমুদ্র তরঙ্গের মত গিয়ে মদীনায় আপতিত হয়’ (আর-রাহীক ৩০১-০৩, ৩০৬ পৃঃ)।

অপরপক্ষে মদীনার হুঁশিয়ার নেতৃত্ব গোয়েন্দা রিপোর্টের মাধ্যমে আগেই সাবধান হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিরোধীদের খবর জানার জন্য যুবায়ের ইবনুল ‘আওয়াম (রাঃ)-কে নিয়োগ করেন। তিনি বলেন, مَنْ يَأْتِينِي بِخَبْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ শত্রুপক্ষের খবর আনার জন্য কে আছে? যুবায়ের বললেন, আমি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য একজন ‘হাওয়ারী’ (নিকট সহচর) থাকে। আমার হাওয়ারী হ’ল যুবায়ের’ (বুখারী হা/২৮৪৬)। শত্রুপক্ষ বলতে এখানে বনু কুরায়যাকে বুঝানো হয়েছে। তারা কুরায়েশদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছে কি না, তার খবর সংগ্রহের জন্য যুবায়েরকে পাঠানো হয়। অতঃপর যুদ্ধ শেষে কুরায়েশ শিবিরের অবস্থা জানার জন্য হুযায়ফাকে পাঠানো হয় (ফাৎহুল বারী হা/৪১১৩-এর আলোচনা)।

অতঃপর অভিজ্ঞ ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ মোতাবেক রাসূল (ছাঃ) মদীনার উত্তর মুখে ওহোদের দিকে দীর্ঘ পরিখা খনন করেন এবং তার পিছনে ৩,০০০ সুদক্ষ সৈন্য মোতায়েন করেন।[১] এর কারণ ছিল এই যে, তিনদিকে পাহাড় ও খেজুর বাগিচা বেষ্টিত মদীনা নগরী প্রাকৃতিক ভাবে সুরক্ষিত দুর্গের মত ছিল। কেবল উত্তর

দিকেই মাত্র খোলা ছিল। যেদিক দিয়ে শত্রুদের হামলার আশংকা ছিল। এখানে পরিখা খনন করা হয়। যার দৈর্ঘ্য ছিল ৫০০০ হাত, প্রস্থ ৯ হাত ও গভীরতা ৭ থেকে ১০ হাত। প্রতি ১০ জনকে ৪০ হাত করে খননের দায়িত্ব দেওয়া হয়' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪২০-২১)। রাসূল (ছাঃ) মদীনার অভ্যন্তর ভাগের সালা' (سَلْم) পাহাড়কে পিছনে রেখে তাঁর সেনাবাহিনীকে খন্দকমুখী করে সন্নিবেশ করেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বনু হারেছার ফারে' (فَارِع) দুর্গে রেখে দেন। যা ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে মযবুত দুর্গ' (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪২৫)।

মুসলিম বাহিনী তীর-ধনুক নিয়ে সদাপ্রস্তুত থাকেন, যাতে শত্রুরা পরিখা টপকে বা ভরাট করে কোনভাবেই মদীনায় ঢুকতে না পারে। মুসলিম বাহিনীর এই নতুন কৌশল দেখে কাফের বাহিনী হতচকিত হয়ে যায়। ফলে তারা যুদ্ধ করতে না পেয়ে যেমন ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকে, তেমনি রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে আতংকিত হ'তে থাকে। মাঝে-মধ্যে পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের ১০ জন নিহত হয়। অমনিভাবে তাদের তীরের আঘাতে মুসলিম পক্ষে ৬ জন শহীদ হন'।[২] উক্ত ৬জন হ'লেন, আউস গোত্রের বনু আব্দিল আশহাল থেকে গোত্রনেতা সা'দ বিন মু'আয, আনাস বিন আউস ও আব্দুল্লাহ বিন সাহল। খায়রাজ গোত্রের বনু জুশাম থেকে তুফায়েল বিন নু'মান ও ছা'লাবাহ বিন গানমাহ। বনু নাজ্জার থেকে কা'ব বিন যায়েদ। যিনি একটি অঙ্গত তীরের মাধ্যমে শহীদ হন (ইবনু হিশাম ২/২৫২-৫৩)। এঁদের মধ্যে আহত সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) বনু কুরায়যা যুদ্ধের শেষে মারা যান (ইবনু হিশাম ২/২২৭)।

অতঃপর আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে। একদিন রাতে হঠাৎ প্রচল্ড ঝঞ্ঝাবায়ু এসে কাফেরদের সবকিছুকে লন্ডভন্ড করে দেয়। অতঃপর তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন، اٰذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের নিকট এসেছিল সেনাদল সমূহ। অতঃপর আমরা তাদের উপরে প্রেরণ করলাম তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সেনাবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি। আর আল্লাহ তোমরা যা কর তা দেখেন’ (আহযাব ৩৩/৯)।

এভাবে ফেরেশতা পাঠিয়ে আল্লাহ সরাসরি সাহায্য করেছেন হিজরতকালে যখন রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) দু'জনে ছওর গিরিগুহায় আত্মগোপন করেছিলেন' (তওবা ৯/৪০), অতঃপর বদর যুদ্ধে (আলে ইমরান ৩/১২৩-২৬), অতঃপর হোনায়েন যুদ্ধে (তওবা ৯/২৫-২৬)। এতদ্ব্যতীত তিনি ও ছাহাবায়ে কেরাম এবং যুগে যুগে তাঁর সনিষ্ঠ অনসারী মুমিনগণ সর্বদা সাহায্য পেয়েছেন ও পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, খন্দকের দীর্ঘায়িত যুদ্ধের অসহনীয় কষ্টের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আল্লাহর নিকট দো‘আ করতে বলেছিলেন، وَأَمِنْ رُوعَاتِنَا، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সংকট দূরীভূত কর এবং আমাদের ভীতি দূর কর’ (সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০১৮)। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী ‘আওফা (রাঃ) বলেন, এদিন রাসূল (ছাঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে দো‘আ করে বলেছিলেন، اللَّهُمَّ مُنْزِلِ الْكِتَابِ سَرِيعِ الْحِسَابِ اهْزِمِ، ‘হে আল্লাহ! হে কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! সম্মিলিত সেনাদলকে তুমি পরাভূত কর। হে আল্লাহ! তুমি ওদের পরাজিত কর ও ভীত-কম্পিত কর’।[3] তাছাড়া নবীগণের বিজয় সাধারণতঃ এরূপ চূড়ান্ত পরীক্ষার পরেই এসেছে। যেমন আল্লাহ বলেন، أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْبِهِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا مَا الْفِتْنَةُ إِلَّا فِي الْأَوَّلِ قُلْ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ عِنْدَ اللَّهِ بِشَاءٍ وَلَسَوْفَ يَأْتِي الْفِتْنَةُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا مَا الْفِتْنَةُ إِلَّا فِي الْأَوَّلِ قُلْ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ عِنْدَ اللَّهِ بِشَاءٍ وَلَسَوْفَ يَأْتِي الْفِتْنَةُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا مَا الْفِتْنَةُ إِلَّا فِي الْأَوَّلِ

তাদের মত অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। নানাবিধ বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেছিল ও তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতীব নিকটবর্তী’ (বাক্বারাহ ২/২১৪)। কুরতুবী বলেন, অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন যে, অত্র আয়াতটি খন্দক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়’ (কুরতুবী, তাফসীর উক্ত আয়াত)। অতএব এই বিজয় রাসূল (ছাঃ)-এর দো‘আ কবুলের প্রমাণ বৈ কি!

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন, খন্দক যুদ্ধের শেষ রাতে যখন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু আসে এবং সবদিকে ঠান্ডা হয়ে যায়, তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, কে আছে যে আমাকে শত্রু পক্ষের খবর এনে দিতে পারবে? সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে’। কথাটি রাসূল (ছাঃ) দু’বার বললেন। কিন্তু কেউ জবাব দিল না। অবশেষে তিনি আমার নাম ধরে বললেন, দাঁড়াও হে হুযায়ফা! আমাদের জন্য খবর নিয়ে এস এবং তাদেরকে যেন আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করো না। অতঃপর আমি উঠলাম এবং এমন আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকলাম যেন তা গরম (অর্থাৎ ঠান্ডা বাতাস ও ঝড়ের কোন প্রকোপ ছিল না)। আমি চলতে থাকলাম এবং পৌঁছে গিয়ে দেখলাম যে, আবু সুফিয়ান আগুন জ্বালিয়ে দেহ গরম করছেন। আমি তীর তাক করলাম। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা স্মরণ হওয়ায় বিরত হ’লাম। অতঃপর ফিরে এসে সব খবর জানালাম। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর মস্তকাবরণ ‘আবা’-র একটি অংশ আমার গায়ের উপর দিলেন। তাতে আমি ঘুমিয়ে গেলাম। কিছু পরে তিনি আমাকে ডাকলেন, ‘فُمْ يَا نَوْمَانُ’ ‘উঠ হে ঘুমন্ত! (মুসলিম হা/১৭৮৮)।

উল্লেখ্য যে, কাফের পক্ষের পরাজয়ের কারণ হিসাবে দু’টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা প্রসিদ্ধ হ’লেও বিশুদ্ধ নয়।[4] আমরা মনে করি, আহযাব যুদ্ধে বিজয়ের জন্য কোনরূপ ‘যঈফ ও সনদবিহীন’ বর্ণনার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহই পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনি তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ু এবং তাঁর অদৃশ্য সেনাবাহিনী অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে বিজয় দান করেছিলেন।

অতঃপর যুদ্ধ শেষে যুলক্বাদাহ মাসের সাত দিন বাকী থাকতে বুধবার পূর্বাহ্নে রাসূল (ছাঃ) মদীনায় ফিরে আসেন’।[5]

ফুটনোট

[1]. আর-রাহীক ৩০৫-০৬ পৃঃ।

এখানে প্রসিদ্ধ আছে যে, (১) পারস্য থেকে হিজরতকারী ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে পরিখা খননের এই নতুন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করা হয়’ (আর-রাহীক ৩০৩ পৃঃ)। যা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। কেননা এটির খবর ‘মুরসাল’ (মা শা-‘আ ১৬২ পৃঃ)। ইবনু হিশাম এটি বিনা সনদে উল্লেখ করে বলেন, ‘يُقَالُ: إِنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ أَشَارَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ’ ‘বলা হয়ে থাকে যে, সালমান ফারেসী এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন’ (ইবনু হিশাম ২/২২৪)। অথচ ইবনু ইসহাক এব্যাপারে কিছু না বলেই বর্ণনা করেন যে, ‘فَلَمَّا سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَجْمَعُوا لَهُ مِنَ الْأَمْرِ، ضَرَبَ الْخَنْدَقَ’ ‘যখন রাসূল (ছাঃ) - عَلَى الْمَدِينَةِ، فَعَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْغِيْبًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْأَجْرِ’ সম্মিলিত বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনলেন, তখন তিনি মদীনার প্রবেশ মুখে পরিখা খনন করতে বললেন।

অতঃপর তিনি নিজে তাতে অংশগ্রহণ করেন উক্ত নেকীর কাজে মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার জন্য’ (ইবনু হিশাম ২/২১৬)। অতএব এটাই সঠিক কথা যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর নির্দেশ (আলে ইমরান ৩/১৫৯) মোতাবেক সকল বৈষয়িক বিষয়ে অভিজ্ঞ ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করতেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) তাদের মধ্যে থাকাটা মোটেই অসম্ভব নয়।

সালমান ফারেসী(سلمان الفارسی) : আবু আব্দুল্লাহ সালমান পারস্যের রামহুরমুয অথবা ইস্ফাহান এলাকার অধিবাসী ছিলেন। মজুসী ধর্মনেতা পিতা তাকে অগ্নি প্রজ্জ্বলন ও উপাসনার কাজে সারাক্ষণ বন্দী রাখতেন। তিনি বলেন, আমার পিতার একটি বড় শস্যক্ষেত ছিল। একদিন আমাকে তিনি সেখানে পাঠান। যাওয়ার পথে আমি একটি গীর্জা অতিক্রম করলাম। তখন তারা ছালাত আদায় করছিল। বিষয়টি আমার কাছে খুব ভাল লাগল এবং আমি বললাম, আল্লাহর কসম! এটি আমাদের দ্বীনের চাইতে উত্তম। এভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিন্তু আমি শস্যক্ষেতে গেলাম না। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় গেলে আমি এই দ্বীন পাব? তারা বলল, শামে গেলে পাবেন। অতঃপর আমি পিতার নিকটে ফিরে এলাম। তিনি বললেন, কোথায় ছিলে? শস্যক্ষেত্রে যাওনি কেন? আমি ঘটনা বললাম। তখন তিনি বললেন, ওদের দ্বীনের চাইতে তোমার ও তোমার বাপ-দাদার দ্বীন উত্তম। আমি বললাম, কখনই না। আল্লাহর কসম! ঐ দ্বীন আমাদের দ্বীনের চাইতে উত্তম। অতঃপর তিনি আমার পায়ে বেড়ী দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন। তখন আমি খ্রিষ্টানদের গীর্জায় খবর পাঠালাম যে, শাম যাত্রী কোন কাফেলা এলে আমাকে খবর দিতে। বেশ কিছুদিন পর আমি উক্ত খবর পেয়ে লোহার বেড়ী খুলে গোপনে তাদের সাথী হয়ে গেলাম। অতঃপর শামে পৌঁছে শেষনবী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে থাকি।... অবশেষে বহুদিন পর আমি ক্রীতদাস হিসাবে ইয়াছরিবে নীত হই। ইতিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) হিজরত করে আসেন এবং খ্রিষ্টান পাদ্রীদের বর্ণিত আলামত সমূহ পরীক্ষা করে আমি তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিত হই। অতঃপর আমি তাঁর নিকট ইসলামের উপর বায়‘আত গ্রহণ করি। ইতিমধ্যে রাসূল (ছাঃ) বদর ও ওহোদ যুদ্ধ হ’তে ফারেগ হন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, হে সালমান! তুমি তোমার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও। তখন আমি ৩০০ খেজুর গাছ লাগানো ও তাজা করা এবং ৪০ উক্কিয়ার বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ হ’লাম। রাসূল (ছাঃ) সবাইকে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মুক্তিতে সাহায্য কর। তখন সবাই খেজুরের চারা দিয়ে আমাকে ৩০০ পূর্ণ করে দিলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ব নির্দেশ মতে আমি তাঁকে ডেকে আনলাম এবং তিনি একটি চারা নিজ হাতে লাগালেন। যার হাতে আমার জীবন, তার কসম করে বলছি, এর ফলে একটি চারাও মরেনি এবং সবগুলি দ্রুত তাজা হয়ে ওঠে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ডিমের ন্যায় একটি সোনার টুকরা আমাকে দিলেন। যা ছিল ৪০ উক্কিয়ার সমান। অতঃপর আমি সেগুলি মনিবকে দিয়ে দাসত্ব হ’তে মুক্ত হই। এরপরে আমি খন্দকের যুদ্ধে যোগদান করি এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করি’ (আহমাদ হা/২৩৭৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৯৪)।

রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক মুক্ত হওয়ায় তিনি তাঁর ‘মুক্তদাস’ (مولى) হিসাবে গণ্য হ’তেন। তিনি ইনজীল ও কুরআনে পারদর্শী ছিলেন। এজন্য তাঁকে ‘দুই কিতাবের পন্ডিত’ (صاحب الكتابين) বলা হ’ত। অত্যন্ত পরহেযগার ও দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। পরবর্তীতে মাদায়েনের গবর্ণর হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে খেজুরের পাতা দিয়ে চাটাই বানিয়ে তার বিক্রয়লব্ধ আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। ধনীর দুলাল হওয়া সত্ত্বেও স্রেফ শেষনবীর সন্ধান ১০ থেকে ১৯ জন মনিবের ক্রীতদাস হ’তে হ’তে অবশেষে তিনি ‘আল্লাহর দাস’ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, أنا سلمان ابن الإسلام من بني آدم, ‘আমি ইসলামের বেটা সালমান একজন আদম সন্তান’।

তাঁর ইশারাতেই খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন করা হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। তিনি ২৫০ মতান্তরে ৩৫০ বছরের দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। ৩৫ অথবা ৩৬ হিজরীতে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন (আল-ইছাবাহ, সালমান আবু আব্দুল্লাহ ক্রমিক ৩৩৫৯; আল-ইস্তী‘আব)।

(২) পরিখা খননের সময় মুহাজির ও আনছারগণ প্রত্যেকেই সালমান ফারেসীকে নিজেদের দলভুক্ত বলে দাবী করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, **سَلْمَانٌ مِنَّا أَهْلُ الْيَبِيتِ** ‘সালমান আমাদের পরিবারভুক্ত’ (হাকেম হা/৬৫৪১; ইবনু হিশাম ২/২২৪)। বর্ণনাটির সনদ যঈফ। আলবানী বলেন, বরং খবরটি আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যা মওকুফ ছহীহ। বর্ণনাটি হ’ল, আলী (রাঃ)-কে বলা হ’ল, আমাদেরকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথীদের বিষয়ে বর্ণনা করুন। জবাবে তিনি বললেন, তাঁদের কার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাস করছ? তারা বলল, সালমান। তিনি বললেন, তিনি প্রথম যুগের এবং শেষ যুগের ইল্ম প্রাপ্ত হয়েছেন। যা এমন এক সমুদ্র, যার তলদেশ পাওয়া যায় না। তিনি আমাদের পরিবারভুক্ত’ (যঈফাহ হা/৩৭০৪-এর আলোচনা; মা শা-‘আ ১৬৫ পৃঃ)।

[2]. আর-রাহীক ৩০৭ পৃঃ; রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ২/১৯১।

লেখক মানছুরপুরী বলেন, এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে আল্লাহ বলেন, **أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ**, **سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ** - ‘কাফেররা বলে যে, আমরা আজ সবাই প্রতিশোধকামী’। ‘কিন্তু দেখবে যে সত্ত্বর ঐ সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হবে এবং তারা পিছন ফিরে পালিয়ে যাবে’ (ক্বামার ৫৩/৪৪-৪৫)। উক্ত আয়াত নাযিলের ২৫ দিন পর যুদ্ধের শেষ দিকে হঠাৎ উত্তপ্ত বায়ুর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আল্লাহর গযব আকারে নেমে আসে। যা অবরোধকারী সেনাদলের তাঁবু সমূহ উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়’ (রহমাতুল্লিল ‘আলামীন ৩/৩১৪-১৫ পৃঃ)। উক্ত আয়াতটি মাক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত। যা রাসূল (ছাঃ) ২য় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের দিন পাঠ করেছিলেন (বুখারী হা/৩৯৫৩)। অতএব এটি ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে নাযিল হওয়ার প্রশ্নই আসেনা।

[3]. বুখারী হা/২৯৩৩; মুসলিম হা/১৭৪২ (২১); মিশকাত হা/২৪২৬।

[4]. যেমন এ সময় রাসূল (ছাঃ) দু’টি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। (১) মদীনার এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন ফসল দিয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করা। (২) শত্রু সেনাদল সমূহের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে তাদের একে অপর থেকে পৃথক করে ফেলা (আর-রাহীক ৩১১ পৃঃ)। প্রথম লক্ষ্য অর্জনে তিনি বনু গাত্তফানের দুই নেতা ওয়ায়না বিন হিছন ও হারেছ বিন ‘আওফের সঙ্গে সন্ধির চিন্তা করেন। যাতে তারা তাদের সেনাদল নিয়ে ফিরে যায়। অতঃপর তিনি উক্ত বিষয়ে দুই সা‘দের মতামত জানতে চাইলেন। তারা বললেন, **يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا فَسَمِعًا** - ‘হে আল্লাহর রাসূল! যদি আল্লাহ এ বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেটা করুন। কিন্তু যদি আপনি এটা আমাদের স্বার্থে করতে চান, তবে এতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই’। কেননা যখন আমরা এবং এসব লোকেরা শিরক ও মূর্তিপূজার মধ্যে ছিলাম, তখন তারা আমাদের একটি শস্যদানারও লোভ করার সাহস করেনি। আর এখন তো আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন ও আপনার মাধ্যমে ইযযত প্রদান করেছেন। এখন কেন

আমরা তাদেরকে আমাদের ধন-সম্পদ প্রদান করব? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মতামতকে সঠিক গণ্য করেন ও বলেন, *إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَصْنَعُهُ لَكُمْ لَمَّا رَأَيْتُ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ* ‘সমগ্র আরব তোমাদের দিকে একই সাথে অস্ত্রসমূহ তাক করেছে দেখে শুধু তোমাদের স্বার্থেই আমি এরূপ করতে চেয়েছিলাম’ (আর-রাহীক ৩১১ পৃঃ; যাদুল মা‘আদ ৩/২৪৪; মুহান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৯৭৩৭; ইবনু হিশাম ২/২২৩। বর্ণনাটির সনদ ‘মুরসাল’ বা যঈফ (তাহকীক, ইবনু হিশাম ক্রমিক ১৩৬১)।

দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জনে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে কাজে লাগান। যেমন বলা হয়েছে যে, বনু কুরায়যার চুক্তিভঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাসূলকে সাহায্য দেবার জন্য এলাহী ব্যবস্থা স্বরূপ আবির্ভূত হন শত্রুপক্ষের জনৈক ব্যক্তি বনু গাত্তফানের নু‘আইম বিন মাসউদ আশজাঈ। তিনি এসে ইসলাম কবুল করেন ও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যুদ্ধের জন্য নির্দেশ কামনা করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ইহুদী বনু কুরায়যা ও কুরায়েশ বাহিনীর মধ্যকার সহযোগিতা চুক্তি বিনষ্ট করার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেবার নির্দেশ দিয়ে বলেন, *خَذِلْ عَنَّا إِنْ اسْتَطَعْتَ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ* ‘যদি তুমি পার, তবে তুমি আমাদের পক্ষে ওদের মনোবল ভেঙ্গে দাও। কেননা যুদ্ধ হ’ল কৌশলের নাম’ (আর-রাহীক ৩১২ পৃঃ)। বর্ণনাটি সনদ বিহীন। তবে বর্ণনাটির শেষাংশ *الْحَرْبُ خُدْعَةٌ* ‘যুদ্ধ হ’ল কৌশলের নাম’ কথাটি ‘ছহীহ’ (বুখারী হা/৩৬১১; মুসলিম হা/১০৬৬; মিশকাত হা/৩৯৩৯, ৫৪১৮)।

উক্ত নির্দেশ পেয়ে নু‘আইম বিন মাসউদ শাওয়াল মাসের এক শনিবারে ইহুদীদের সাপ্তাহিক পবিত্র দিনে বনু কুরায়যার কাছে যান এবং বলেন, কুরায়েশ পক্ষকে আপনারা সাহায্য করবেন না। কেননা যুদ্ধে হার-জিত যাই-ই হোক, তারা চলে যাবে। কিন্তু আপনারা এখানে থাকবেন। তখন মুসলমানেরা আপনাদের উপর প্রতিশোধ নিবে। অতএব কুরায়েশদের কিছু লোককে বন্ধক রাখার শর্ত করা ব্যতীত আপনারা তাদের সাহায্য করবেন না। এতে তারা রাযী হয়। অন্যদিকে কুরায়েশ পক্ষকে গিয়ে তিনি বলেন, মুহাম্মাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করায় ইহুদীরা লজ্জিত। এক্ষণে তারা আপনাদের সাহায্য করবে না, যতক্ষণ না আপনারা তাদের কাছে আপনাদের কিছু লোককে বন্ধক রাখেন। পরে উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছে গেলে একই কথা শোনে এবং তাদের মধ্যে পরস্পরে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ফলে সহযোগিতা চুক্তি ভেঙ্গে যায় এবং এভাবে নু‘আইমের কূটনীতি সফল হয়’ (ইবনু হিশাম ২/২২৯-৩১)। ইবনু ইসহাক ঘটনাটির সনদ উল্লেখ করেননি। ফলে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ হ’লেও বিশ্বাস্য নয় (সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৭৭৭; মা শা-‘আ ১৭০ পৃঃ)।

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) ফাৎহুল বারীর মধ্যে নু‘আইম বিন মাসউদ-এর উপরোক্ত ঘটনাটি ইবনু ইসহাক-এর বরাতে বর্ণনা করে বলেন, নু‘আইম একজন চোগলখোর (رَجُلًا نَمُوْمًا) ব্যক্তি ছিলেন। যিনি একজনের কথা অন্যজনকে লাগিয়ে কার্যসিদ্ধিতে পটু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বলেন, ইহুদীরা আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে যে, কুরায়েশ ও গাত্তফানের কোন একজন নেতাকে তাদের নিকট বন্ধক রাখলে তারা তাদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করবে, নইলে নয়। তুমি এ কথাটি উভয় পক্ষকে গিয়ে বল’। তখন নু‘আইম দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে ইহুদী বনু কুরায়যা ও কুরায়েশ উভয় পক্ষকে উক্ত কথা বলেন। ফলে তাদের মধ্যকার সন্ধি ভঙ্গ হয়ে যায়। আর এটাই ছিল তাদের পরাজয়ের কারণ’ (ফাৎহুল বারী হা/৪১০৫-এর আলোচনা, ৭/৪০২ পৃঃ)। মূলতঃ উক্ত বর্ণনাটি ইবনু ইসহাকের নয়। বরং বায়হাকী দালায়েলুন নবুঅতের এবং সেটিও যঈফ (দালায়েল ৩/৪৪৭ পৃঃ; মা শা-‘আ ১৭০-৭২ পৃঃ)।

ইহুদীদের উক্ত বদ স্বভাবের বিষয়ে দেখুন সূরা বাক্বারাহ ২/১২০, সূরা আনফাল ৮/৫৫-৫৬ প্রভৃতি। আধুনিক যুগে ফিলিস্তীন, ইরাক, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাথে ইহুদী-নাছারা ও কাফের চক্রের কপটাচরণ ও চুক্তিভঙ্গের অসংখ্য নযীর বিদ্যমান রয়েছে।

[৫]. ইবনু সাঈদ ২/৫৪; আর-রাহীক ৩১৩ পৃঃ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5499>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন